শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৫, ১৩ ও ১৪তম সংখ্যা, ১লা অগ্রহায়ণ ১৪১৮ (১৮ই নভেম্বর ২০১১) মূল্য - ২ টাকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

পাখিরা ধার দেয়, সুদে আসলে আদায় করে

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

পাখিরাও মহাজনি কারবার করে। তবে এত সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন এই ব্যবস্থা যে, যে কোনও মনুষ্য পরিচালিত আধুনিক ব্যাঙ্ককেও হার মানায়। খবরটা শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও আশ্চর্যজনক ভাবে সত্যি। বহু বছরের কষ্টসাধ্য নিরীক্ষণের মাধ্যমে আজ এটা জানা সম্ভব হয়েছে যে বিভিন্ন পাখিদের মধ্যে অন্তত পক্ষে আড়াইশো জাতের পাখি আছে যারা নিখুঁতভাবে মহাজনি কারবার করে, মানে খাবার ধার দেয় অন্য পাখিদের, পরে সুদে আসলে তা উসুল করে নেয়। এইসব পাখিদের অনেকগুলোই আমাদের চেনা যেমন - কাক, চিল, বাজ, চড়াই, পায়রা, টিয়া।

পাখি নিয়ে যে ধরনের পড়াশোনা করা হয় সেই বিষয়টির ইংরেজি নাম Ornithology আর পক্ষীবিশেষজ্ঞদের বলা হয় Ornithologist। আমাদের দেশের পক্ষীবিশেষজ্ঞ ডঃ সালিম আলির নাম অনেকেরই জানা। তাঁর লেখায় পাখিদের এই আশ্চর্য ব্যবহারের কথা আছে। তবে এই বিচিত্র অভ্যাস নিয়ে বিশেষ ধরনের গবেষণা চালিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত পাখিবিশারদ ডঃ সুর্বোল গ্রেগরি। তাঁর লেখা থেকে পাখিদের মধ্যে খাবার লেনদেনের বিশদ পরিচয় পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে সারস, বাদুড়, ফড়িং বা কাঠঠোকরাদের মধ্যে লেনদেনের যে হিসেবনিকেশ হয় তা একেবারে মানুষের মতো নিঃখুত এবং পাকা। চড়াই পাখিরা মূলত আঙুর, লালরঙের তেলাপোকা আর মশা ধার দেয়। শোধ দেবার সময় একদিন থেকে চার হপ্তা পর্যন্ত। যে চড়াইকে ধার দেওয়া হয় তাকে আসলের দেড়গুণ মাপের খাবার ফেরত দিতে হয়। ধার শোধের আগে দু'পক্ষ ঠোঁটে ঠোঁট মেলায় কথার দাম থাকছে এটা বোঝানোর জন্যে। তারপর যে ধার নিয়েছে সে অন্য চড়াইকে নিয়ে যায় নিজের ভাঁড়ারে, একটা একটা করে সব খাবার সামনে এনে রেখে দেয়। টিয়া, পায়রা ধার দেবার ব্যাপারে ভীষণ চালাকি করে। অভাবী পাখি দেখলে এরা খাবারের লোভ দেখিয়ে তাকে ধার দেয় শতকরা দু'শতাংশ হারে। কড়া নজর রাখে কখন প্রতিপক্ষ খাবার জোগাড় করছে। সময়ের অপেক্ষা না করেই সুদ সমেত আসল আদায় করে। বক বা চিল ধার দেয় কিন্তু ধার শোধ নেওয়ার জন্যে এরা ধার গ্রহণকারী স্বজাতীয় পাখিকেও রেহাই দেয় না -- রীতিমতো উত্যক্ত করে, মারধোরও করে, আঁচড়ে দেয়। ধার দেওয়ার ব্যবস্থা খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায় জলের পাখিদের মধ্যে। মাইগ্রেটরি বার্ডস বা পরিযায়ী পাখিরাও এই ধরনের লেনদেনের অংশীদার। ধার দেওয়ার সময় কয়েকটা ব্যপার খেয়াল রাখা হয় যেমন বয়স, খাবার সংগ্রহ করার ক্ষমতা, যাকে ধার দেওয়া হয় সে স্ত্রী না পুরুষ পাখি এইরকম সব বিষয়।

কাকেরা ধার দেয় রুটি, মাংস, ফল, দই এইরকম খাবার। চার শতাংশ হারে সুদসমেত ধার উসুল করে নেওয়া হয় এক হপ্তার মধ্যেই। ধার শোধ না করলে ধারদানকারী অপরপক্ষকে রীতিমতো দাবড়ে দেয় সময়ে শোধ করার জন্য। রুগ্ন বা আহত পাখিদের অবশ্য ধার শোধ করার থেকে ছাড় দেওয়া হয়। ধার দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করে মোরগরা। মুরগি বা ছোট বাচ্চা পাখিদের কাছ থেকে এরা কোনও সুদ নেয় না। একদিনের মধ্যেই অন্য মোরগরা ধার শোধ করে দেয়। কাঠঠোকরা আবার গাছের ওপর ঠোঁট দিয়ে দাগ কেটে রাখে কত ধার দিয়েছে তার হিসেব রাখার জন্য। দিন পনেরোর মধ্যেই সুদসমেত ধার উসুল করে। বাদুড়েরাও একই পদ্ধতিতে হিসেব রাখে। একটা বিষয়ে কিন্তু পক্ষীকুলের সব লেনদেনকারী পাখিদেরই ভীষণ মিল আছে। তা হল মেয়ে পাখি, অসুস্থ বা আঘাত পাওয়া পাখি বা বাচ্চাদের ওপর কোনও জোর খাটানো হয় না। বরং কিস্তিতে শোধ দিলেও তা নিয়ে নেয় ঋণদাতা। খাবার সংগ্রহের ব্যাপারে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পাখিরা। তাই পরিশ্রমের ফসল ঠিক ঠিক ব্যবহার করার ব্যাপারে এরা বিশেষ যত্নবান।

এন.বি.এ থেকে প্রকাশিত লেখকের 'আকাশ, পৃথিবী ও মানুষের কথা' (দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থ থেকে পুর্নমুদ্রিত। ছবি ঃ সুব্রত মাজী

চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এবারে চারহাজার কেন্দ্রে ৪র্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার পরীক্ষার্থী, এর মধ্যে হাওড়া জেলায় ৬৯টি কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭,৮৭৭ জন। সরকারী উদ্যোগে পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ শুরু করে বেসরকারী উদ্যোগে পরীক্ষার ব্যবস্থা।

লিগ ফাইনাল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আমতা জয়পুর থানা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায়, অমরাগড়ী এ্যাথলেটিক ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ফুটবল লিগের চূড়ান্ত পর্বের খেলা হয় ১৩ই নভেম্বর ক্লাবের মাঠে। খড়িয়প একাদশ ও সোমেশ্বর সন্তোষনগর মৈত্রী সংঘের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে খেলা শেষ হয় গোল শূন্য অবস্থায়। টাইব্রেকারে খড়িয়প একাদশ ৪-৩ গোলে জয়ী হয়।

খেলায় উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত মিত্র, এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিব্যেন্দুসুন্দর দাস, সম্পাদক নিখিল সামন্ত, এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতি নিমাই রায় ও এ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ।

বন্যা প্রতিরোধে গণ ডেপুটেশন

বাবু হক ঃ ২০১১ সালে হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গার সাথে আমতা ২নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে বন্যার জল ছিল প্রায়১৫ দিন। ব্লকের ৮০টি গ্রামের মধ্যে ৬১টি সম্পূর্ণভাবে এবং ২৯টি আংশিকভাবে ক্ষতির সন্মুখীন হয়েছিল। ২৫০০ টি বাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয় ও ১২৫টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আনুমানিক ৩২৫ হেক্টর আউস ধান, ৫৫০০ হেক্টর আমন ধান, ৪২৫ হেক্টর খারিফ শস্য, ১২০ হেক্টর পাট, ৫০ হেক্টর ধানচাষ সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সব্জি চাষেও ক্ষতি হয়েছে।

আমতা ২নং ব্লক আর যাতে বন্যাকবলিত না হয় তার ব্যবস্থা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের দাবিতে আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে থেকে ১১ই নভেম্বর আমতা ২নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিষয় ছিল বন্যাকবলিত এলাকা ঘোষণা, স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা, চাষের জন্য বোরোজলের সরবরাহ, সর্টকাট চ্যানেলের দামোদর ও রূপনারায়ণ নদীমুখে রেগুলেটর সহ বাকি কাজ শেষ করা, বন্যা বা বৃষ্টির জলে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামত করা, রামপুরখালের বাঁধ উঁচু করা ও বিভিন্ন খাল ও নদীর সংস্কারের ব্যবস্থা করা।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত মিত্র, দাশুরথী দীর্ঘাঙ্গী, গোলাম কুদ্দুস, রাজশ্রী আদক ও হরিপদ রায় প্রমুখ।

স্মরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র রায়ের জন্মভিটায় গত ৯ই অক্টোবর তাঁর স্মৃতি রক্ষা সমিতি এক স্মরণ সভার আয়োজন করে। মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে ও 'শিবায়ন' গ্রন্থে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কবি নিমাই মান্না। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষনে কবিচন্দ্রের জীবনীসহ কাব্যকৃতির দীর্ঘ্য আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে শিবায়ণ কাব্য পাঠও করা হয়। কাব্যটি পুর্ণমুদ্রণের দাবীও ওঠে সভায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবির পরিবারের সদস্য প্রশান্তকুমার রায় সহ আশিস্ কুমার রায়, বিশ্বনাথ বসু, জয়দেব রায় প্রমুখ।

বিজয়ার আড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালী ব্যানার্জী লেনস্থ প্রমাণ পত্রিকা দপ্তরে ২৩ অক্টোবর হাওড়া প্রেস ক্লাবের পরিচালনায় 'বিজয়ার আড্ডা' শীর্ষক আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। বিশিষ্ট সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন বিচারপতি ডঃ অলোককুমার মুখোপাধ্যায় বিজয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া ছিল প্রবীণ ক্লাব সদস্য কবি সীতাংশু শেখর চক্রবর্ত্তীর 'প্রমাণ করে যাই' নামক এক গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ, আর ছিল গান ও আবৃত্তি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজনকুমার পল্লে ও সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুজিতকুমার পাল।

সালকিয়া ছাত্র সমিতির অনুষ্ঠান

সৌরভ সিংহ ঃ সালকিয়া ছাত্র সমিতির ৪১ তম শ্যামাপুজো উপলক্ষে পুজো প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় সফল অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয় ২৮শে অক্টোবর । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত কুমার পাল, শৈলেশ্বর পান্ডা ও তরুণকুমার মন্ডল প্রমুখ।

সমিতির তরফে সুব্রত রায় জানান সমিতি পুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বাসযাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণ, হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ ও নানা সমাজ সেবা মূলক কাজ করে থাকেন।

স্মরণসভা

বাবু হক ঃ আমতা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে প্রয়াত জননেতা সমীর রায়-এর স্মরণে কল্যাণপুর বাজারে ৬ই নভেম্বর এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

রক্তদান ও দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঞ্জয়বাড় সাওড়াবেড়িয়া মোহাম্মাদিয়া মাদ্রাসা কমিটি ও গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ৮ ও ৯ই নভেম্বর ৭ম বর্ষ রক্তদান শিবির, ২য় বর্ষ দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ ও মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে ১৭তম বর্ষ উদ্‌যাপনে ওয়াজ মহফিলে হয়। শিবিরে ১০জন মহিলা সহ ৩৭ জন রক্ত দেন। ৫০জন মহিলা ও ২০জন পুরুষকে বস্ত্র দেওয়া হয়। এছাড়াও ছিল কেরাত ও গজল প্রতিযোগিতা, এতে অংশ নেয় প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী। ৯জনকে উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অসিত মিত্র, দাশরথী দীর্ঘাঙ্গী, সৈয়দ আবু মহম্মদ মহসিন, সাংবাদিক মহম্মদ মহসিন খান, ইব্রাহিম সাহেব, আব্দুস সামাদ সাহেব ও সোভালী লস্কর প্রমুখ। উল্লেখ্য যে ১৯৮২ সালে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভূমিদান করেন গোলাম পানজাতন ও বাদশা বেগম। বর্তমানে এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ২০জন দুঃস্থ ছাত্র আবাসিক হিসাবে পড়াশোনা করছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাবু হক ও সেখ আক্রম।

‘শিক্ষা আনে চেতনা’

সম্পাদকীয়

বর্ধমানের জামবনির যতীন্দ্রনাথ মাহাতোকে কে আর মনে রেখেছে! অথচ ১৫ বছর আগেও মানুষটি ছিলেন সংবাদের শিরোনামে কারণ তাঁর ভিটের চারপাশের গাছে বাসা বাঁধতো প্রায় হাজারদেড়েক পরিযায়ী পাখি। ৬৮ বছরের যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী সুশীলার সংসারের কাজ বলতে ছিল ওই পাখিদের দেখভাল করা। এ’রকম মানুষ সংসারে সত্যিই বিরল কিন্তু পাখি ভালোবাসেন না এ’রকম মানুষও বিরল। যদিও আক্ষেপের বিষয় এই যে শহরে তো বটেই গ্রামাঞ্চলেও উন্নয়নের কবলে পড়ে বনাঞ্চল বা গাছপালার সংখ্যা যে হারে কমছে তাতে পাখিদের অস্তিতই ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। গাছ না থাকলে পাখি থাকবে কোথায়, বাসা বাঁধবে কোথায়, নতুন প্রজাতির জন্ম হবে কিভাবে? বাধ্য হয়েই পাখির দল খাবারের সন্ধানে সরতে সরতে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে, সেদিকে ‘উন্নয়নকামী’ মানুষদের হুঁশই নেই। এ চিত্র শুধু হাওড়া শহরের নয়, গোটা পৃথিবীর। ফলে পক্ষীকূল সত্যিই জটিল সমস্যার সম্মুখীন কিন্তু পাখি না থাকলে পরিবেশ বাঁচে না, ভারসাম্য নষ্ট হয়, ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয়। এককথায় গোটা ‘ইকো সিস্টেম’টিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আরও আশ্চর্যের ও আক্ষেপের বিষয় হল এই যে যেখানে পাখিদের আস্তানা তাকে রক্ষা করার বিষয়েও মানুষ উদাসীন। প্রমাণ? হাতের কাছেই রয়েছে এ জেলার তথা পশ্চিমবাংলার অন্যতম বিখ্যাত পাখিরালয় সাঁতরাগাছি ঝিল যেখানে প্রতি বছর অন্তত হাজার পাঁচেক পরিযায়ী পাখি বেড়াতে আসে। হাইওয়ে থেকে ঝিলে যাবার বা ঝিল পরিষ্কার করে এটিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও বাস্তবে কোন সরকারী উদ্যোগ চোখে পড়ে না। অথচ এই ঝিলেই ‘প্রকৃতি সংসদ’ নামক এক পাখি চেনার সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবছর নিয়মিত বসে পাখি চেনানোর আসর। স্কুলপাঠ্যে পাখির কথা থাকলেও পড়ুয়ারা শুধু ছবিতেই পাখি চেনে। অথচ বাংলায় পাখি সম্পর্কে দু’টি অসাধারণ বই আছে একটি অজয় হোমের ‘বাংলার পাখি’ অন্যটি সালিম আলির ‘সাধারণ পাখি’, দুটি বইই স্কুলে পাঠ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। বাৎসরিক পিকনিক, খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো পাখি চেনানোর কোন অনুষ্ঠান হাওড়ার কোন স্কুল নিয়মিত ভাবে করে থাকে এমন তথ্যও নেই। ফলে সাধারণ ভাবে পাখি ভালোবাসলেও বা কাক, চড়াইকে খাবারদাবার দিলেও পাখি সম্পর্কে জানার যে অনেক কিছু আছে তা অগোচরেই থেকে যায়। সে কারণেই এই সংখ্যাটি প্রকাশের পরিকল্পনা। পাখি সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ বাড়ুক সেই সঙ্গে সংরক্ষণের সচেতনতাও, অনেকের মত এই আশা পোষণ করি আমরাও।

‘জেলার খবর সমীক্ষা’র গ্রাহক হন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪৫ টাকা

লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে। পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।

যোগাযোগ করুন — সম্পাদকীয় দপ্তরে

গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।

ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

ফিরে দেখা - জেলা হাওড়া (দ্বাত্রিংশ পর্ব)

— সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

আগের সংখ্যার পর

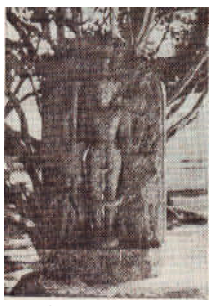

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি

আগেই বলা হয়েছে ভারতবর্ষে বিষ্ণুপূজার চল বেদের আমল থেকেই চালু ছিল কিন্তু সে যুগে মূর্তিপুজোর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না বরং নানা ধরণের যজ্ঞের উল্লেখ আছে যেগুলিতে ব্যবহৃত হত নিখুঁত জ্যামিতিক নকশায় তৈরি করা যজ্ঞবেদী। বিষ্ণুর যে ২৪টি নাম আগের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সেই নামগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ কিছু পুরনো ‘লেখ’এ পাওয়াগেছে। Centre for Historical Studies New Delhi এর গবেষক রণবীর চক্রবর্ত্তী তাঁর লেখা ‘ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব’ (প্রথমভাগ) গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের ‘ঘোসুন্ডি লেখ’তে নারায়ণের উল্লেখ আছে বলে লিখেছেন। সেখানে শিলাপ্রাকার ‘নারায়ণবাটক’ বা পাথর বেষ্টিত নারায়ণের উপাসনালয়ের উল্লেখ আছে। ‘নারায়ণবাটক’ নামক এই উপাসনালয়ে পূজিত হতেন সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব। এই উপাসনালয়ের গঠনের কৃতিত্বের দাবীদার রাজা সর্বতাত, যিনি একাধারে ভাগবতধর্মাবলম্বী আবার অশ্বমেধ যজ্ঞকারী। সঙ্কর্ষণ বা বলরাম ও বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ দুই ভাই। মহাভারতে এঁরা দু’ভাই যাদব বংশোদ্ভুত। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের গোড়ার দিকে মথুরায় পঞ্চবৃষ্ণিবীর প্রতিমাগুলি মথুরায় এক দেবালয়ে রক্ষিত ছিল, ঐ সময় মথুরা ছিল শক ক্ষত্রপ শোভাসের অধিকারাধীন। এই পঞ্চবৃষ্ণিবীর হলেন সঙ্কর্ষণ বা বলরাম, বাসুদেব কৃষ্ণ, প্রদ্যুjÀ (রুক্মিণী ও বসুদেবের পুত্র), শাম্ব (জাম্ববতী ও বসুদেবের পুত্র) এবং অনিরুদ্ধ। পরে কীভাবে কৃষ্ণ শুধুমাত্র ভাগবতধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন সে এক রহস্য। উল্লেখ্য যে বিষ্ণুর যে ২৪টি নামের উল্লেখ আগে করা হয়েছে এবং পূজা পদ্ধতির (“ওঁ কেশবো মার্গশীর্ষে চ পৌষে নারায়ণ স্তথা। মাধবো মাঘমাসে চ গোবিন্দঃ ফাল্গুনে তথা।। চৈত্রে বিষ্ণুরিতি খ্যাত বৈশাখে মধুসূদনঃ। জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রমো নাম আষাঢ়ে বামনস্তথা।। শ্রীধরঃ শ্রাবণে চৈত্র হৃষিকেশশ্চ ভাদ্রকে। আশ্বিনে পদ্মনাভশ্চ দামোদরশ্চ কার্ত্তিকে।। বিষ্ণোর্দ্বাদশনামানি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ। সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।”) কথা বলা হয়েছে বর্তমানে গৃহস্থগৃহতো বটেই বিষ্ণু মন্দিরগুলিতেও এই রীতিতে পুজোর চল নেই। পুজো হয় শালগ্রাম শিলায়। কারণ হিসেবে এটুকু অনুমান করা যেতে পারে এই শ্লোক রচিত হয় পুরাণের যুগে। বেদের অনেক পরবর্তী সময়ে পুরাণের যুগে মূর্তিপুজোর চল শুরু হয়। আফগানিস্থানের আইখানুমের উৎখনন থেকে পাওয়া আগাথোক্লেসের মুদ্রায় চতুর্ভূজ কৃষ্ণ বা বিষ্ণু মূর্তির ও হলধর বলরামের মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল। বলরাম ও বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপী মূর্তির এটি এযাবৎ পাওয়া প্রাচীনতম নিদর্শন। ফলে বোঝা যায় ভারতের বাইরেও বিষ্ণুমূর্তি পুজোর চল ছিল। প্রায় একই সময়ে তক্ষশিলার গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস এর দূত হেলিয়োডোরস বিদিশায় আসেন। তিনি সেখানে একটি গরুড়স্তম্ভ তৈরী করেন। স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখ-তে এর উল্লেখ আছে। লেখা আছে ‘দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজ অয়ং করিতে ইঅ হেলিওদোরেণ ভাগবতেন ..... তখখসিলাকেন যেনি দূতেন ’’। সাতবাহনদের রাণী নয়নিকার আরাধ্য দেবদেবীর তালিকায়ও সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ আছে।

বঙ্গদেশে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবকের সেনা নায়ক বখতিয়ার খিলজী ছিলেন প্রথম বিজিত বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তা। দীর্ঘ প্রায় ১৩৬ বছর সময় বঙ্গদেশকে শাসন করার জন্য দিল্লী থেকে মোট ২৫জন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করা হয়। এঁদের সকলেই যে উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এমন নয়। ফলে এই সময়কালে বহু হিন্দু মন্দির ধবংসপ্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুপূজার চলও কমে আসে।

আগেই বলা হয়েছে যে হাওড়ায় যে মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি পাল-সেন যুগের। মন্দির ধবংসের কথা এই কারণে উঠছে যে এই মূর্তিগুলি সবই নদীখাত বা খাল খননের সময় মাটির তলা থেকে উদ্ধার হয়। তোলার সময় কি তোলা হচ্ছে না জানা থাকায় শাবল, কুড়ুল বা ওই ধরনের যন্ত্রের আঘাতে মূর্তিগুলির অঙ্গহানি হয়। যেহেতু ভগ্নমূর্তি পূজা হয়না, তাই এই মূর্তিগুলি আগে উল্লিখিত মন্দিরগুলিতে বা দেওয়ালের গায়ে রক্ষিত রয়েছে। যে সামান্য ক’টি অক্ষত মূর্তি পাওয়াগেছে তার একটি রাখা আছে বালিটিকুরী কালীতলায় দোতলায় এক মন্দিরের দ্বিতলে। মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত মানু চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন যে এই মন্দিরটি ব্যাঁটরা নিবাসী কালীপদ সরকারের বংশের মন্দির এবং বংশ পরম্পরায় তাঁরাই এই মূর্তির পূজকরূপে নিযুক্ত আছেন। মূর্তিটি কীভাবে পাওয়াগেছে সেই বিষয়ে তিনি কোন তথ্য দিতে পারেন নি কিন্তু এটি জানিয়েছেন যে এই মূর্তির পূজক ছিলেন একজন সাধু, মৃত্যুর পর যাঁকে মন্দিরের একতলায় সমাধিস্থ করা হয়। সমাধি মন্দিরের সামনের দিকে রয়েছে তিনটি মূর্তি -- কালী, শনিদেব ও বিপত্তারিণী মায়ের মূর্তি। উপরেই দোতলায় রক্ষিত রয়েছে ফুট তিনেক উচ্চতার চতুর্ভূজ বিষ্ণু ও শিবের মূর্তি, মূর্তির নীচে একটি শ্বেতপাথরের ফলক রয়েছে ফলকে হিন্দীতে উৎকীর্ণ -- মনতোগনী দেবী, ১২নং কোরাবাগান। কে এই মনতোগনী দেবী, কেন এবং কবে তিনি এই ফলকটি স্থাপন করেন তাও জানা যায়নি। মন্দিরের ডানদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। কে এই সাধু, কবে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় বা তিনি কোথাকার লোক ছিলেন এ’সব বিষয়ে কোন তথ্য তিনি জানাতে অস্বীকৃত হওয়ায় এই মন্দির ও মূর্তি সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা থেকে গেছে। শুধু জানা গেছে এই যে মূর্তির নিত্যপূজা হয় কিন্তু কোন বিশেষ পার্বণ বা তিথিতে আলাদা করে কোন পুজো হয়না।

বালিটিকুরীর বিষ্ণুমূর্তি

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ব্যাক্টো ক্লিনিক এন্ড ল্যাবরেটরী

এখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফী, রক্ত, মল, মূত্র, কফ অতিযত্ন সহকারে পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে। ই.সি.জি. করা হয় এবং কোলকাতা থেকে থাইরয়েড পরীক্ষা করানো হয়।

অমরাগড়ী (অমরাগড়ী বি.বি.ধর হসপিটালের সামনে), জয়পুর, হাওড়া-৭১১৪০১

মডার্ন ডিজিটাল স্টুডিও এ্যান্ড জেরক্স সেন্টার

প্রো ঃ বিমল দোলুই

জয়পুর মোড় (থানার নিকট) হাওড়া। ফোন-৯৭৭৫১৩০৩২০

এখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি, স্টীল ফটোগ্রাফি, মিক্সিং ও জেরক্স করা হয়।

৫ মিনিটে পাসপোর্ট ছবি পাওয়া যায়।

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ দান সংগ্রহ কেন্দ্র

পরিচালনায় ঃ অমরাগড়ী যুব সংঘ

আমরা শুধু অঙ্গিকার চাই না,

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ চাই।

০৩২১৪-২৩৪-১৬৫, ৯৪৩৪৫৬৪৯৪৯

এই সংখ্যায় নিয়মিত ধারাবাহিক অলোককুমার মুখোপাধ্যায় রচিত ‘যাঁদের নিয়ে হাওড়ার ইতিকথা’ প্রকাশ করা গেল না পরের সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। অনিবার্য কারণে এটি যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হল।

সম্পাদক

● এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পৃথিবীর প্রাচীনতম পাখিটি হল আর্কিওপটরিক্স লিথোগ্রাফিকা। আজ থেকে ১৫০,০০০,০০০ বছর আগে জুরাসিক যুগে এটি পৃথিবীতে বাস করত। আর্কিওপটরিক্সের মধ্যে সরীসৃপ ও পাখি দুইয়ের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। এদের শরীরে ডানা ও পালক থাকলেও পাখিদের মতো ঠোঁট ছিল না। মুখ ছিল সরীসৃপের মতো। তেমনই পাখিদের ওড়ার জন্য দরকারি বুকের লম্বা হাড়ও ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির জন্য বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন যে এরা সত্যিই উড়তে পারত না কি শুধুই ভেসে থাকতে পারত। আর্কিওপটরিক্সের ফসিলগুলি পাওয়া গেছে জার্মানীর সোল্‌নহোফেন অঞ্চলের চুনাপাথরের স্তর থেকে। আর্কিওপটরিক্সের প্রথম ফসিলটি পাওয়া যায় ১৮৬১ সালে। এই ফসিলটি 'লণ্ডন স্পেসিমেন' বা 'লণ্ডন নমুনা' হিসাবে পরিচিত।

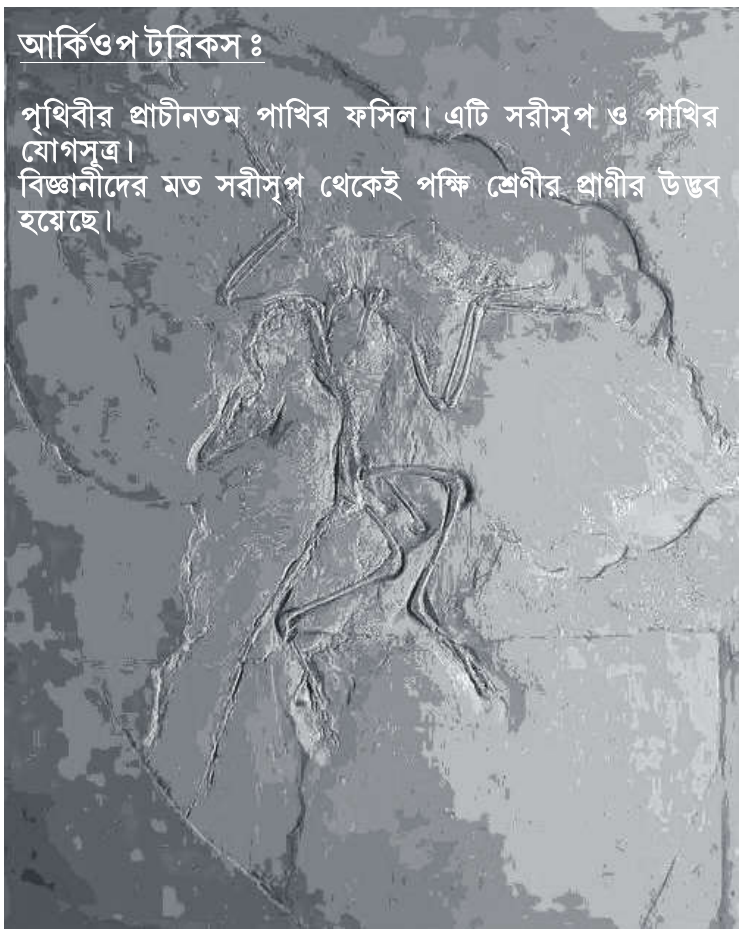

● পাখিদের যে বৈশিষ্ট্য তাদের অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করেছে তা হল পালক। পালক পাখিদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল উড়তে সাহায্য করা। পালক পাখির ত্বককে বৃষ্টির জল, তাপ এমন কি ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকেও বাঁচায়।

● প্রাণীদের মধ্যে যে শুধু পাখিরাই উড়তে পারে তা নয়। বাদুড় স্তন্যপায়ী হয়েও উড়তে সক্ষম। অর্থোপডা শ্রেণীর পতঙ্গরা পাখিদের আবির্ভাবের বহু যুগ আগে থেকেই পৃথিবীতে উড়ে বেড়াচ্ছে।

● সমস্ত পাখিরই জন্ম ডিম থেকে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ডিমের আকার ও রং ভিন্ন হয়। ডিমের রং যাই হোক না কেন তা দুটি রঞ্জক কণিকার ওপর নির্ভর করে। একটি নিঃসৃত হয় হিমোগ্লোবিন থেকে এবং অন্যটি পিত্ত থেকে। বেশিরভাগ প্রজাতির পাখি তাদের বাসাতে ডিম পাড়ে।

● পাখিদের মধ্যে অস্ট্রিচ হল আকারে সবচেয়ে বড়। এদের ভারী শরীর, ছোট মাথা, লম্বা পা এবং লম্বা গলা। উড়তে না পারলেও এরা ঘন্টায় প্রায় ৪৫ কি.মি. বেগে দৌড়তে পারে। একটি পূর্ণবয়স্ক অস্ট্রিচের ওজন হয় ২২০ থেকে ৩৫০ পাউণ্ড এবং সেটি ৭ থেকে সওয়া ৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। অস্ট্রিচের ডিম পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিম।

● পাখির ঠোঁট অর্থাৎ চঞ্চুটি কেরাটিন জাতীয় প্রোটিন দিয়ে তৈরী। পাখির ঠোঁট তাদের খাদ্যগ্রহণের প্রকৃতি অনুসারে নানান আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন, জল থেকে মাছ ধরার জন্য বকের ঠোঁট হয় লম্বা। অন্যদিকে শস্য ভেঙে খাওয়ার জন্য চড়াই পাখির ঠোঁট শক্ত এবং ছোট হয়।

● ঈগলের ঠোঁটের আঘাতের শক্তি রাইফেলের বুলেটের আঘাতের শক্তির থেকে দ্বিগুণ।

● অস্ট্রেলিয়ান পেলিক্যানের ঠোঁট পাখিদের মধ্যে দীর্ঘতম। সাড়ে ১৮ ইঞ্চি বা ৪৭ সেন্টিমিটার পর্যন্ত এদের ঠোঁট লম্বা হয়।

● উড়তে পারা পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে ভারী 'দ্য গ্রেট বাস্টার্ড' পাখি। একটি ছ'বছর বয়সী বাচ্চার সমান ওজন এই পাখির।

● সবচেয়ে লম্বা ডানার পাখি অ্যালবাট্রস।

● পাখিদের মধ্যে একমাত্র হামিংবার্ডই পিছন দিকে বা পাশাপাশি উড়তে পারে।

● 'গ্রিন হেরন' নামের পাখিটি মাছ ধরার জন্য টোপ ব্যবহার করে। মাছেদের আকর্ষণ করার জন্য এরা জলের ওপর জীবন্ত পোকামাকড় ফেলে। মাছেরা সেগুলো খেতে এলেই পাখিটি তাদের লম্বা ঠোঁট দিয়ে ধরে ফেলে।

● পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 'দ্য আর্কটিক টার্ন' নামের পাখিটি। প্রতি বছর এরা আর্কটিক থেকে আন্টার্কটিকা পর্যন্ত ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ মাইল বা ৩২,০০০ থেকে ৪০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

● পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি 'বি হামিংবার্ড'। এরা লম্বায় মাত্র ২.৫ ইঞ্চি বা ৬.২ সেন্টিমিটার এবং ওজন মাত্র ১.৬ গ্রাম।

● 'নর্দান জ্যাকানাস' নামের পাখিটি জলের ওপর হাঁটতে পারে। এই বিরল বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের 'জেসাস বার্ড' বলে।

● আর্কিওপটরিক্সের ফসিল থেকে বিজ্ঞানীদের মত সরীসৃপ থেকেই পক্ষিশ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে, যদিও এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে এখনও অনেক তথ্যের অভাব রয়েছে। বর্তমানে একটি মতে পাখিদের উৎপত্তি হয়েছে থিওরেপেডাস নামে মেসোজোয়িক যুগের এক শ্রেণীর ডাইনোসর থেকে। থিওরেপেডাসের সঙ্গে আধুনিক কালের পাখিদের অনেক বিষয়ে মিল পাওয়া যাচ্ছে। এদের উভয়েরই ফাঁপা হাড়, কোমরের একটি হাড় পিছন দিকে ঘুরে গেছে, ঘাড় ও বুকের সংযোগস্থলে এক বিশেষ প্রকারের হাড় এবং পায়ে তিনটি করে আঙুল।

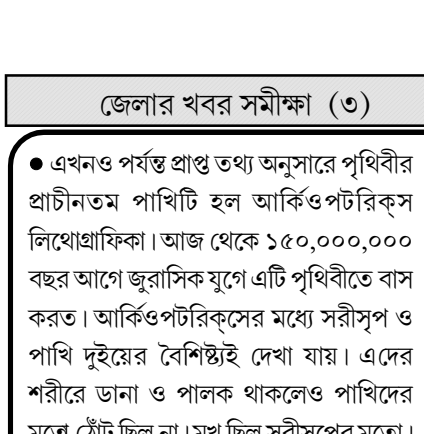

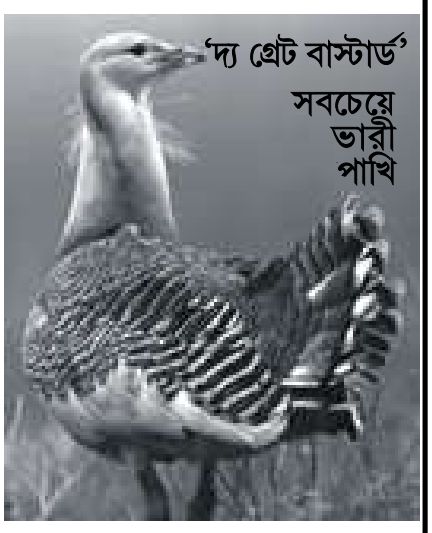

সালিম আলি ঃ ভারতের পক্ষিমানব

জন্ম ঃ ১২ নভেম্বর, ১৮৯৬, মুম্বাই
মৃত্যু ঃ ২৭ জুলাই , ১৯৮৭, মুম্বাই

সালিম মইজুদ্দিন আবদুল আলি ছিলেন একজন প্রখ্যাত পক্ষিবিদ। তিনি 'বার্ডম্যান অফ ইণ্ডিয়া' বা 'ভারতের পক্ষিমানব' নামেই বেশী পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পাখিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ প্রথম যাঁরা শুরু করেছিলেন, সালিম আলি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ভারতীয় পাখিদের নিয়ে লেখা বইটি পক্ষিবিদ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পর বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'র প্রধান কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন তিনি। ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে তিনি সোসাইটির জন্য সরকারী সহায়তার ব্যবস্থা করেন। ভরতপুর পাখিরালয়, যা কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান নামে পরিচিত, তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে। তাঁরই উদ্যোগে 'সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশানাল পার্ক' ধবংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। পরিবেশ রক্ষায় অবদানের জন্য ১৯৭৬ সালে তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক খেতাব 'পদ্মবিভূষণ' সম্মান লাভ করেন।

সালিম আলির জন্ম হয়েছিল মুম্বাইয়ের এক সুলেমানি বোহরা মুসলিম পরিবারে। তিনি ছিলেন পিতামাতার নবম সন্তান। মাত্র এক বছর বয়সে পিতা মইজুদ্দিন এবং তিন বছর বয়সে মা জিনাত-উন-নিসা'কে হারান। মামা আমিরুদ্দিন তায়েবজি এবং নিঃসন্তান মাসি হামিদা বেগম সালিম ও তাঁর অন্যান্য ভাইবোনকে বড় করে তোলেন। তাঁর আর এক মামা আব্বাস তায়েবজি ছিলেন প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। ছেলেবেলায় একদিন সালিম খেলনা বন্দুকের গুলিতে একটা চড়াই পাখি মেরে ফেলেন। পাখিটা সাধারণ চড়াইয়ের থেকে একটু আলাদা ধরনের ছিল। চড়াইয়ের গলায় হলুদ রং দেখে সেটির সম্বন্ধে আরও জানার জন্য মামার সঙ্গে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে যান। সোসাইটির সেক্রেটারি ডব্লু.এস.মিলার্ড সালিমকে তাঁদের পাখির সংগ্রহশালা ঘুরিয়ে দেখান। তিনি সালিমকে পাখির বিষয়ে অনেকগুলি বই দেন, মৃত পাখিকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি শেখান এবং পাখি সংগ্রহ করার জন্য উৎসাহ দেন। মিলার্ড সালিমের সঙ্গে সোসাইটির প্রথম কিউরেটর নরম্যান বয়েড কিনিয়ারের পরিচয় করিয়ে দেন। মূলত এঁদের সান্নিধ্যে সালিমের পাখিদের বিষয়ে আগ্রহ জন্মায়। সালিম তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য ফল অফ এ স্প্যারো'তে লিখেছেন হলুদ-গলার চড়াই পাখিটি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, যার ফলে তখনকার দিনে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পেশা পক্ষিবিদ্যাকে তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথমে শিকারের বই এবং পাখি শিকারে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল। মামা আমিরুদ্দিনের উৎসাহে সালিম তখন আশেপাশে নানা শিকার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। সে সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন এক দূর সম্পর্কের ভাই ইসকান্দার মির্জা যিনি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন।

সালিমের লেখাপড়া শুরু হয় 'জনানা বাইবেল মেডিকেল মিশন গার্লস হাইস্কুল'এ। এরপর ভর্তি হন মুম্বাইয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তেরো বছর বয়সে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শরীর সারাবার জন্য তাঁকে সিন্ধ প্রদেশে পাঠানো হয়। এতে তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। ১৯১৩ সালে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। পারিবারিক টাংস্টেনের খনি এবং কাঠের ব্যবসার কাজ দেখাশোনা করতে তিনি বর্মা যান। ১৯১৭ সালে দেশে ফেরার পর তিনি আবার পড়াশোনা শুরু করেন। বাণিজ্যিক আইন এবং হিসাবশাস্ত্রপড়ার জন্য তিনি ডাভার্স কলেজ অফ কমার্সে ভর্তি হন। এখানে সকালের বিভাগে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে দিবা বিভাগে জুলজি নিয়ে পড়তে থাকেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার এথেলবার্ট ব্লাটার তাঁকে জুলজি পড়ার সুযোগ করে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকার জন্য তিনি 'জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'তে যোগ দিতে পারলেন না। ১৯২৬ সালে মুম্বাইয়ের 'প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়াম'এ গাইড-লেকচারার হিসাবে চাকরি পান। চাকরির সঙ্গেই তিনি পড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। দু'বছর কাজ করার পর, কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ১৯২৮ সালে তিনি জার্মানি যান সেখানকার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজিক্যাল মিউজিয়ামে অধ্যাপক আরউইন ট্রেসিমানের অধিনে কাজ করার জন্য। জার্মানিতে বার্নহার্ড রেন্স, অস্কার হেইনরথ এবং আর্নস্ট মায়রের মত সেই সময়ের সেরা পক্ষিবিদদের সঙ্গে সালিমের পরিচয় হয়। ১৯৩০ সালে সালিম দেশে ফেরেন। টাকার অভাবে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়াম' গাইড-লেকচারার পদটি বন্ধ করে দিলে সালিম কর্মহীন হয়ে পড়েন। এই সময় হায়দ্রাবাদ, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর এবং ভূপালের দেশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ওই সব অঞ্চলের পাখিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এ কাজে তাঁকে উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন হিউ হুইসলার। প্রথমে অবশ্য হুইসলার সালিমের ওপর বিরক্তই ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সালিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন। হুইসলার নিজে ভারতের নানা জায়গা ঘুরে ভারতীয় পাখিদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে ছিলেন। সেই সব তথ্যকে ভিত্তি করে তিনি 'স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান বার্ড' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধে লেখা একটি তথ্যের ভুল ধরিয়ে দিতে সালিম সঠিক তথ্য দিয়ে পত্রিকাকে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিটি প্রকাশ পেলে হুইসলার সালিমের ওপর প্রচণ্ড বিরক্ত হন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর সংগৃহিত পাখিটিকে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেন সালিমই ঠিক তিনি ভুল। নিজের ভুল বুঝতে পারার পর তিনি নিজে সালিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন।

সারা জীবন নানা সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। ১৯৫৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল 'জয় গোবিন্দ ল স্বর্ণ পদক', ১৯৭০ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্স একাডেমি 'সুন্দর লাল হোরা স্মৃতি পদক' প্রদান করে। সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেছে ভারতের তিনটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় — ১৯৫৮ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৭৮ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৭ সালে ব্রিটিশ অরনিথোলজিস্টস্ ইউনিয়ন থেকে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ইংলণ্ডের বাইরে তিনিই প্রথম এই পদক পান। ঐ বছরই তিনি বিশাল অঙ্কের 'জ. পল গেট্টি ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার' পান, যার পুরোটা দিয়ে তিনি 'সালিম আলি নেচার কনজারভেশন ফাণ্ড' গঠন করেন। ১৯৬৯ সালে 'ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যাণ্ড ন্যাচারাল রিশোর্স' তাঁকে জন সি ফিলিপ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৭৩ সালে ইউ.এস.এস.আর. একাডেমি অফ মেডিক্যাল সায়েন্স তাঁকেপাভলোভস্কি শতবার্ষিকী স্মৃতি পদক প্রদান করে। ঐ বছরই নেদারল্যাণ্ডের রাজকুমার বার্ণহার্ড তাঁকে 'কমাণ্ডার অফ দ্য নেদারল্যাণ্ডস্ অর্ডার অফ দ্য গোল্ডেন আর্ক' খেতাব প্রদান করেন। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৮ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৭৬ সালে পদ্মবিভূষণ খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন।

--- *জহর চট্টোপাধ্যায়*

বিজ্ঞান বার্তা

• পক্ষিবিদ্যা •

বিজ্ঞানসম্মত পক্ষিচর্চাকে 'পক্ষিবিদ্যা' বা 'অরনিথোলজি' বলে। জীববিদ্যা বা প্রাণীবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল 'পক্ষিবিদ্যা' বা 'অরনিথোলজি'। এই বিভাগে পক্ষি বা এভিস শ্রেণীভুক্ত প্রাণী বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। গ্রিক শব্দ অরনিথা ও লোগোস মিলে এই 'অরনিথোলজি' শব্দটি গড়ে উঠেছে। অরনিথা শব্দের অর্থ মুরগী এবং লোগাস শব্দের অর্থ বিজ্ঞান। পক্ষি বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম লেখাটি লিখেছেন অ্যারিস্টটল। তাই অ্যারিস্টটলকেই পক্ষিবিদ্যা বিষয়ের জনক বলা যায়। তিনিই ১৭০টিরও বেশী পাখির বিষয়ে লিখেছিলেন। 'অরনিথোলজি' শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ১৬৭০ সালে প্রকাশিত 'ব্লটিণ্টস গ্লসোগ্রাফিয়া' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে। পক্ষিবিদ্যা বিষয়ে সবচেয়ে বড় অবদানটি জন রে'র। তাঁর লেখা ১৬৭৬ সালে 'অরনিথোলজিয়া' এবং ১৭১৩ সালে 'সিনপ্সিস মেথোডিকা এভিয়াম' গ্রন্থদুটিকে পক্ষিবিদ্যার আকর গ্রন্থ বলা হয়। পাখিদের শ্রেণী বিভাজনের কাজটি প্রথম করেন কর্লোস লিনেয়াস, ১৭৫৮ সালে। পাখিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণী বিভাজনের যে পদ্ধতি তিনি দেখিয়েছিলেন তারই কিছু পরিবর্তন করে আজও ব্যবহার হয়। পক্ষিবিদ্যা বা অরনিথোলজিতে পাখিদের শ্রেণীবিভাগ, অভিযোজন, শারীরিক গঠন, অভ্যাস, গান, উড়ান ও প্রজনন পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

• পাখির নাম •

বিভিন্ন প্রজাতির পাখির বিজ্ঞানসম্মত নাম দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে পাখিটির গণ এবং দ্বিতীয় অংশটিতে তার প্রজাতিকে বোঝায়। আমাদের অতি পরিচিত দুটি পাখি, যাদের আমরা আমাদের ঘরে দেখতে পাই, চড়াই ও মুরগীর বিজ্ঞান সম্মত নাম যথাক্রমে 'প্যাসের ডোমেস্টিকাস' ও 'গ্যালাস ডোমেস্টিকাস'। অনেক সময় প্রজাতির বদলে দ্বিতীয় অংশটিতে যে পক্ষিবীদ পাখিটিকে প্রথম খুঁজে পেয়েছেন তাঁর নামও থাকে। এই দ্বি-নামিক পদ্ধতির জায়গায় বর্তমানে অত্যাধুনিক ত্রি-নামিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেখানে দ্বি-নামিক পদ্ধতির সঙ্গে তৃতীয় নাম হিসাবে উপ-প্রজাতির উল্লেখ করা হয়। পাখিদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর বিজ্ঞানীরা দশ হাজারেরও বেশী প্রজাতির পাখিকে তাদের সঠিক বর্গ, গোত্র ও গণ অনুসারে শ্রেণীভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। পাখিদের সঠিক প্রজাতি নির্ণয় করতে বর্তমানে ডি.এন.এ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোঃ-- অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co. Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori, Jaypur, Howrah. **Editor - Shibnath Chakraborty. Contact No. 9800286148**